বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২৩৫-২৪০
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

কোভিড-১৯ ব্যবস্থাপনা গবেষণা: কেরালা মডেল ও বাংলাদেশের শিক্ষণীয়

মিহির কুমার রায়*

সারসংক্ষেপ *এই প্রবন্ধটি তৈরির মূখ্য উদ্দেশ্য হলো করোনা ব্যবস্থাপনায় তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণার ফলাফলের আলোকে কেরালা মডেলের প্রাসংঙ্গিকতা ও বাংলাদেশের সঙ্গে একটি তুলনামুলক পর্যালোচনা যা থেকে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় উঠে এসেছে। এই প্রবন্ধটি তৈরীতে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন সেকেন্ডারি উৎস থেকে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ এই অভিঙ্গতা কাজে লাগিয়ে অনেক মহামারির মোকাবেলা করতে পারে।*

মূল শব্দ *ভাইরোলজি · লকডাউন মডেল · রোগীর ক্লাস্টার · কেরালা মডেল · সামাজিক কর্মসূচি*

ভূমিকা

১. করোনা ভাইরাসের গতি-প্রকৃতি

করোনা ভাইরাস নিয়ে শিক্ষা, গবেষণা ও সম্প্রসারণ এই তিনটি কাজ একেবারেই ভাইরোলজি, মাইক্রোবায়োলজি ইত্যাদির বিষয় বিশেষত মেডিক্যাল সায়েন্স বা বায়োলজিক্যাল সাইন্সের বিষয় নিয়ে যারা গবেষনায় রত তারাই অনুধাবন করতে পারেন। করোনাভাইরাস আসার ফলে আমরা এর মাহাত্ম্য, গভীরতা ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারছি যা এর আগে এমনটি হয়নি। যে ভাইরাস এ রোগ ছড়ায় সেটিই করোনা ভাইরাস নামে পরিচিত যা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত এবং জিনগত বৈশিষ্ট্য ও ভাইরাসের পরিবারের বিবেচনায় এর নামকরণটি করে একটি আন্তর্জাতিক কমিটি। সে কারণেই রোগ ভেদে নামের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় যেমন এইডস রোগের ভাইরাস এইচআইভি নামে পরিচিত। আমরা করোনা পরিবারের চারটি ভাইরাস নিয়ে চলছি যা সাধারন জ্বর-কাশির সৃষ্টি করে যা মারাত্মক নয়। এই পরিবারের পাঁচ নম্বর ভাইরাসের কারণে সার্স রোগের উৎপত্তি হয়, যার কারণে ২০০৪ সালে বিভিন্ন দেশে ৭৭৪ জনের মৃত্যু হয়েছিল। করোনা পরিবারের ষষ্ঠ ভাইরাসের কারণে সৃষ্ট রোগের নাম মার্স, যার প্রভাবে ২০১২ সালে আক্রান্ত হয়ে আক্রান্তের ৪৪ শতাংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। আবার করোনা পরিবারের

* অধ্যাপক (অর্থনীতি), ডিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ ও সিন্ডিকেট সদস্য, সিটি ইউনিভার্সিটি, ঢাকা;
ই-মেইল: mihir.city@gmail.com

৭ম সদস্য হিসাবে সার্স-কভি-২ নামে ভাইরাস কোভিড-১৯ ২০১৯ সালে অতর্কিতে আক্রমণ করে সারা বিশ্বকে তছনছ করে দিচ্ছে, যা এক নতুন অভিজ্ঞতা মাত্র। এভাবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া যেমন প্লেগ, স্প্যানিশ ফ্লু ইত্যাদি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছিল। এতে কোটি কোটি লোকের মৃত্যু হয়েছিল। আবার দুইটি ভাইরাস যেমন জল বসন্ত (ভেরিওলা) ও রিনডারপেস্ট নির্মুল হয়েছে সত্যি। কিন্তু এর জন্য ভাইরাসের বংশ বিস্তার, ক্ষেত্র, টিকা, চিকিৎসা, অর্থ, সরকারের অঙ্গীকার ও সময়ের প্রয়োজন। বর্তমানে উপস্থিত করোনা ভাইরাসের (কোভিড-১৯) বয়স মাত্র ১৮ মাস এবং এরই মধ্যে সারা বিশ্বের ১০০টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই রোগের টিকা আবিষ্কারে নিরলস কাজ করে চলছে, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে ।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তালিকায় কোভিড-১৯ ও এর ভাইরাস নিয়ে প্রায় ১৫ হাজার গবেষণাপত্র রয়েছে। এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে যেমন প্রিকোশন, প্রিভেনশন, প্রমোশন, প্রটেকশন, পারসোয়েশন এবং প্রতিকার। এর প্রস্তুতি ও প্রতিকার হিসাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, রোগীকে আলাদা রাখা, এলাকা লকডাউন, মাস্ক ব্যবহার, সেনিটাইজার দিয়ে ঘনঘন হাত ধোয়া, রোগ শনাক্তকরণের জন্য পরীক্ষা, গাইডলাইন, প্রশিক্ষণ, হাসপাতালে চিকিৎসার সুযোগ সৃষ্টি, অনলাইন পরামর্শ ইত্যাদি রয়েছে। কিন্তু কোভিড-১৯ এর সংক্রমণের বহনমুখী মাধ্যম থাকায় এর প্রকোপ বাড়ছে। এই প্রজাতির ভাইরাসের সংক্রমণ ক্ষমতা যেমন বহুবিধ তেমনি মানুষের শরীরে এর আক্রমণ ক্ষমতাও বহুবিধ। এটি পরিপাকতন্ত্র, ফুসফুস, হৃদ্‌যন্ত্র ও মস্তিষ্কের স্ট্রোক বাড়িয়ে দেয়। এই ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য পৃথিবীজুড়ে ভ্যাকসিন আবিষ্কারের প্রচেষ্টা চলছে। তেমনি আছে রোগ নিরাময়ের ও ওষুধ আবিষ্কারের সফল প্রয়াস। বর্তমানে চিকিৎসার জন্য চারটি পদ্ধতি আছে যেমন এন্টিবডি থেরাপি, এন্টিভাইরাস থেরাপি, প্লাজমা থেরাপি ও অন্যান্য রোগে ব্যবহৃত ওষুধের প্রয়োগ।

২. করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) নিরাময়ে প্রায়োগিক গবেষণার বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

এখন আসা যাক প্রাযোগিক গবেষণার দিক থেকে বিশ্ব কিংবা আমরা কোথায় আছি বা থাকব। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে জনঘনত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক আচরণ-সংস্কৃতির বিবেচনায় করোনা সংক্রমণ নিরসনে সব দেশকেই নিজস্ব পদ্বতি কিংবা মডেল উদ্ভাবন করা উচিত। সেই বিবেচনায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্য গবেষকেরা বলছেন, জুলাই-আগস্ট মাস করোনা ভাইরাস ছড়ানোর পিক মৌসুম থাকবে যদি বৃষ্টির প্রবণতা বেশি হয় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে। বিশ্বের ২১০টি আক্রান্ত দেশে ও অঞ্চলের মানুষ ভাইরাস বহন করেই তাদের জীবন ও জীবিকার জন্য বেঁচে থাকতে হবে, যার অর্থ এই দাঁড়ায় যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দীর্ঘস্থায়ী হবে বিশেষত কোনো ধরনের প্রতিষেধক ওষুধ এখন পর্যন্ত আবিষ্কার না হওয়ার কারণে যদিও গণমাধ্যমে জানা যায় গবেষণা শুরু হয়েছে, যার অগ্রগতির ফলাফল পেয়ে ওষুধ বাজারে আসতে আরও অনেক সময় লাগবে যদিও ভ্যাকসিনই একমাত্র রক্ষাকবচ, যার চাহিদা অনুসারে সরবরাহ অপ্রতুল। বাংলাদেশে চিকিৎসা গবেষণায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল (বিএমআরসি), জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট), স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট, আইসিডিডিআরবি ও রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি। তা ছাড়াও দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সায়েন্স অনুষদের মাইক্রোবায়োলজি ও ভাইরোলজি বিভাগও এই বিষয়ে গবেষণা করে থাকে। করোনা পরিস্থিতির থেকে আমাদের অনেক শিক্ষণীয় থাকলেও তা অনেকটা ব্যবহারিক পর্যায়ে থেকেই নিতে হবে, যা আমাদের মানুষের জন্য অনুশীলন কিছুটা কঠিন ।

এখন আসা যাক বাংলাদেশ উদ্ভাবিত লকডাউন মডেল, যা এরই মধ্যে সফল প্রমাণিত হয়েছিল গত বছর জারীকৃত ঢাকার পূর্ব রাজাবাজার এলাকায়, যেখানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন প্রশাসনিকভাবে সহায়তা করে ছিল। তিন সপ্তাহব্যাপী এই লকডাউনে যৌক্তিক কারণ ছাড়া কাউকে ঘর থেকে বের হতে দেওয়া

হয়নি এবং নিরাপত্তাকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবী দল চাহিদামাফিক ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়েছে। সেই এলাকায় করোনা পরীক্ষার জন্য চিৎসা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছিল এবং যাদের পজেটিভ এসেছিল, তাদের করোনার জন্য প্রতিষ্ঠিত বিশেষ হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তিন সপ্তাহ কাল অতিবাহিত হলে সেই লকডাউন পরিহার করে দ্বিতীয়বারের মতো দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার ওয়ারীতে আবার তিন সপ্তাহের জন্য লকডাউন কার্যকর করা হয়। দেশের অর্থনীতিবিদরা ভাবছেন, কাজকর্ম শুরু করা দরকার, নইলে করোনা হাত থেকে বাঁচলেও অনাহারে ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচা দুষ্কর হবে। এখন লকডাউন শিথিল করার ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তিনটি প্রশ্ন রেখেছেন এবং এগুলো হলো—

(১) মহামারি নিয়ন্ত্রণে এসেছে কি না?

(২) সংক্রমণ বাড়লে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা বাড়তি চাপ নিতে সক্ষম কি না?

(৩) জনস্বাস্থ্য নজরদারী ব্যবস্থা কি রোগী ও তার সংস্পর্শে আসা ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে এবং সংক্রমণ বৃদ্ধি চিহ্নিত করতে সক্ষম?

এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হলেও লকডাউন প্রত্যাহারের বিষয়টি সহজ নয়। এ ব্যাপারে দক্ষিণ কোরিয়ার অভিজ্ঞতায় দেখা গেল সংক্রামিত এক রোগীর সংস্পর্শে আসা অপর অনেক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার পর পানশালা ও নৈশক্লাব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। চীনে উহানের লকডাউন তুলে নেওয়ার পর প্রথমবারের মতো রোগীর ক্লাস্টার চিহ্নিত হয়েছে। জার্মানিতে বিধিনিষেধ শিথিলের পর সংক্রমণ আরও বাড়তে শুরু করছে। তারপরও এই তিনটি দেশ তাদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং এই সুযোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশই করোনা পরীক্ষা রোগী শনাক্তকরণ পৃথক্করণ ও চিকিৎসায় সক্ষমতা অর্জন করেছে এখন জীবন ও জীবিকার রক্ষার্থে অনেক দেশ লকডাউন সীমিত আকারে পর্যায়ক্রমে শিথিল করার পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই পদ্ধতিতে অর্থনীতি সচল করার পাশাপাশি ভাইরাস সংক্রমণের ওপর নজর রাখা সম্ভব হবে। বাংলাদেশ দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় করোনা মোকাবিলায় দেশ যে পথে অগ্রসর হচ্ছে তা বিশ্লেষণের দাবি রাখে। বাংলাদেশ সরকারের সামনে এখন দুটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো— জীবন সুরক্ষা ও জীবিকার পথ প্রশস্ত করা।

৩. কেরালা মডেল: বৈশিষ্ট্য, কর্মপদ্ধতি ও প্রাসঙ্গিকতা

ভারত প্রজাতন্ত্রের ২৮টি রাজ্যের মধ্যে কেরালা একটি। মোট জনসংখ্যা ৩.৪৮ কোটি। প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮৫৯ জন লোকের বসবাস, যার মধ্যে হিন্দু (৫৪.৭০%), মুসলিম (২৬.৯০) ও খ্রিস্টান (১৮.৪)। ভারতের আর্থসামাজিক সূচকে এই রাজ্যটি দেশের পথিকৃত। যেমন জন্মহার কমানোতে, আয়ু বাড়ানোতে, নারীর অধিকতর ক্ষমতায়ন এবং সর্বভারতীয় শিক্ষার হার (৯৪%), যা দেশটির শীর্ষে। এ ছাড়াও জনগণের জন্য রয়েছে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসুচি। নাই ক্ষুধার্ত মানুষ, নাই সামাজিক শোষণ (রাজা-প্রজার সম্পর্ক)। যেকোনো সংকটে আছে শিক্ষিত জনসাধারণের দায়িত্বশীল আচরণ ও সহযোগিতা। এখানকার প্রায় ১৭ শতাংশ মানুষ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কাজ করে। পর্যটন শিল্প এই রাজ্যটির আয়ের একটি বড় অংশ, যেখানে প্রতিবছর ১৭ লাখের বেশি পর্যটক ভ্রমণে আসে। এ ধরনের একটি প্রেক্ষাপটে এই রাজ্যটি কীভাবে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় একটি মডেল হিসাবে আবির্ভূত হলো, যেখানে খোদ দিল্লীর মসনদেরই নজর নেই! কেরালা রাজ্যটি দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিস্ট-সমাজতান্ত্রিক শাসনে থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে সামাজিক আচরণগুলো যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে, যা অন্য রাজ্যগুলোতে ততটা নয়। আর তা-ই কেরালা মডেলে প্রতিফলিত হয়েছে।

ভারতে প্রথম করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা যায় এই কেরালাতে, যেখানে জানুযারির শেষে চীনের ওহান থেকে আসা এক ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্রের আগমনের পর এবং তা দ্রুত বাড়তে থাকে জ্যামিতিক গতিতে প্রায় দু মাস। তার পরপরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ২৪ মার্চ লকডাউন ঘোষণা করে এমন একটা সময়ে যখন কেরালাতে কোভিড-১৯ এর পিক পিরিয়ড চলছিল। তারপর থেকেই রাজ্যটিতে সংক্রমণের হার কমতে থাকে। সুস্থ হয়ে ওঠার রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, মৃত্যুর হার কমে ০৫.৩ শতাংশে পৌছে এবং জনদুর্ভোগ অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় সবচেয়ে কমে আসে। কেরালা রাজ্যেরে এই দ্রুত সাফল্যের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ বলেন, জনস্বাস্থ্য বিভাগ ব্যাপক চেষ্টা, ট্রেসিং ও ২৮ দিনের কোয়ারিন্টিনের মাধ্যমে প্রাথমিক অবস্থাতেই রোগ নিণর্য়ে অগ্রাধিকার দিয়েছে। রাজ্যের সরকার চারটি বিমানবন্দর দিয়ে যারা এসেছেন, তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে সন্দেহভাজন হলেই দ্রুত কোয়ারিন্টিনে পাঠিয়েছে, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ রাজ্যে দুর্যোগ ঘোষণা করে স্কুল-কলেজ বন্ধ করে দিয়েছে, জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং মার্চের প্রথম দিকে লকডাউন কার্যকর করতে ৩০ হাজার স্বাস্থ্যকর্মীকে মাঠে নামিয়েছেন এবং লাখো মানুষকে কোয়ারিন্টিনে রাখার ব্যবস্থা করেছে। তা ছাড়াও এই রাজ্যটি স্বাস্থ্য অবকাঠামোতে সবচেয়ে বেশি সম্পদ ব্যয় করছে। গ্রামপর্যায়ে শক্তিশালী কাঠামো তৈরি করছে, তহবিল দিয়েছে, অংশগ্রহণ সহযোগিতামুলক সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, পাশাপাশি গড়েছে সক্রিয় নাগরিক সমাজ, মুক্ত-স্বাধীন গণমাধ্যম, প্রতিযোগিতামূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থা তথা শক্ত গণতন্ত্রের ভিত্তি, জনপ্রতিনিধিদের ওপর উঁচু মাপের আস্থা ইত্যাদি। আরও মজার ব্যাপার যে যারা স্বল্প আয়ের মানুষ বাসায় বন্দী, খবর পাওয়ামাত্রই পুলিশ তাদের বাসায় খাবার পৌঁছে দিয়ে আসে এবং বন্ধ স্কুলের শিক্ষার্থীদের যারা পুষ্টিকর খাদ্যের জন্য স্কুলের ওপর নির্ভরশীল ছিল, তাদের কাছে খাদ্য পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া সমাজভিত্তিক সংগঠন কুদুমবাশরী চমৎকার সামাজিক কর্মসূচি নিয়েছে যেমন মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ, ক্ষুধার্ত লোকদের মাঝে আহার বিতরণ ইত্যাদি।

৪. বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিকতা

এখন কোভিড-১৯ মোকাবিলায় কেরালা মডেলের আলোকে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় বা এ থেকে আমাদের কী শিক্ষণীয় হতে পারে তার একটি বিশ্লেষণ এখানে প্রাসঙ্গিক। দক্ষিণ ভারতের কেরালা রাজটি মডেল উপহার দিয়েছে একইভাবে করোনাকালীন বিশ্বে কোভিড-১৯ মোকাবিলায় কেরালা মডেল আলোচনার শীর্ষে চলে এসেছে। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীরা প্রধানত দুটি ঝুঁকির সম্মুখীন হয় যথা স্বাস্থ্য ও জীবিকা। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের খবর পাওয়া যায় প্রথমত ৮ মার্চে, ২০২০ ইতালি থেকে আসা এক ব্যাক্তির মাধ্যমে। ২৬ মার্চ অর্থাৎ ১৮দিন পর সরকার দেশের সর্বক্ষেত্রে লকডাউন ঘোষণা করে। সাথে সাথে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে যায় এবং এতে করে বিশেষভাবে ব্যক্তিমালিকানায় প্রতিষ্ঠানগুলোয় নিয়োজিত ব্যক্তিরা সংকটে পড়ে। এতে করে সরকারের সামনে দুটি চ্যালেঞ্জ আবির্ভূত হয়, যথা স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও জীবিকার ঝুঁকি। এই বিবেচনায় বাংলাদেশ ও কেরালার অভিজ্ঞতার একটি তুলনামুলক চিত্র তুলে ধরা হলে, দেখা যাবে—

১. কেরালায় সংক্রমণ দেখা যায জানুয়ারির শেষে এবং দু মাসের মধ্যে যখন পিক পিরিয়ড চলছিল, তখনই ভারত সরকার সারা দেশে লকডাউন ঘোষণা করে। কিন্তু কেরালা এর আগেই ফেব্রুয়ারিতে লকডাউনে যায় এবং রোগ শনাক্তকরনের ওপর সবচেয়ে জোর দেয়, যা বাংলাদেশ তিন মাসের বেশি সময় অতিবাহিত হয়েছিল। এক্ষেত্রে দেশের স্বাস্থ্যখাতের অবকাঠামাগত দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।

২. কেরালার স্বাস্থ্যব্যবস্থা খুবই শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দুর্যোগ আসার সাথে সাথে কয়েক হাজার স্বাস্থ্যকর্মীকে কাজে লাগিয়েছে এবং ১ লাখ মানুষকে কোয়ারিন্টিনে পাঠিয়েছে, যা বাংলাদেশে কল্পনাই করা যায় না।

৩. কেরালায় দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট সরকার দ্বারা পরিচালিত বিধায় স্বাস্থ্য অর্থনীতিকে সুসংগঠিত করেছে, যার ফলে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনের একটি ধারা সৃষ্টি হয়েছে। অথচ বাংলাদেশ স্বাস্থ্যখাতের বাজেট বরাদ্দ সবচাইতে কম, যা জিডিপির ০.৮ শতাংশ এবং মোট বাজেটের প্রায় ৬ শতাংশের নিচে।

৪. কেরালা রাজ্যে বেসরকারি সামাজিক সংগঠনগুলো দুর্যোগ মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, বাংলাদেশে তেমনটি দেখা যায় না। তথ্য মতে সারা দেশে ১ হাজারের অধিক দেশি-বিদেশি এনজিও থাকলেও তাদের মাস্ক কিংবা হ্যান্ড সেনিটাইজার বিতরণ, খাদ্য সহায়তা প্রদান, লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা, করোনা প্রতিরোধ কেমপেইন ইত্যাদি দেখা যায়নি।

৫. কেরালা সরকার তাদের চিকিৎসাসেবা ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম যেমন দারিদ্র মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছানো কিংবা বন্ধ থাকা স্কুলগুলোর শিশুদের কাছ পুষ্টিকর খাদ্য পৌঁছাতে সরকারের পাশাপাশি সামাজিক সংগঠনকে বেশি ব্যবহার করেছে। অথচ বাংলাদেশ সরকার তার প্রশাসনযন্ত্রকে এ কাজে ব্যবহার করেছে, যেখানে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি কিংবা সংসদ সদস্যদের তেমন দেখা যায়নি।

৬. কেরালা সরকার জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি বিবেচনা করে ধাপে ধাপে পরিকল্পনামাফিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু করছে, যা বাংলাদেশে হয়নি। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই সরকার ৩১ মে, ২০২০ থেকে কেবল শিক্ষাখাত ছাড়া সকল অথনৈতিক কর্মকাণ্ড চালু করছে, যা স্বাস্থ্য ঝুঁকিকে অনেক মাত্রা বাড়িয়েছে।

৭. করোনা মোকাবিলায় অন্যতম একটি বিষয় হচ্ছে খাদ্যনিরাপত্তা, যার সাথে কৃষি জড়িত। কেরালা সরকার ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করেছে অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক কৃষক সংগঠন তৈরি করেছে এবং কৃষকদের পেনশনের আওতায় আনা হয়েছে, যা প্রশংসনীয়। বাংলাদেশ কৃষিতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলেও কৃষকের সমস্যা যেমন পণ্যমূল্য নিয়ে চরমত বিপাকে কৃষকেরা। আর পেনশনের কথা তো ভাবাই যায় না।

৫. উপসংহার ও সুপারিশ

কেরালা মডেলের সাফল্যের কারণ বিকেন্দ্রীভূত সরকার ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, জনসেবার মানসিকতা, নাগরিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সরকারের জবাবদিহি। বলা যায়, আবেগতাড়িত না হয়ে নিজের পরিবারকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখার জন্য সবকিছুই নিজের অবস্থান থেকে করতে হবে। স্বাস্থ্যখাতে সরকারি প্রধান্য ফিরিয়ে আনতে হবে, আগামী বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে, করোনার মহামারি আমাদের নতুন জীবনাচারে উপনীত করেছে।